দিনে দিনে বাড়ছে দায়

আবীর হাসান

উনিশ বা বিশ, খুব একটা হেরফের হয় না। কেননা যে এ দেশে সরকার আর আইসিটির মধ্যে মিলমিশ তেমন হয় না। প্ল্যান বা আলোচনা কথাবার্তা যতই থাক এই অমিশেলি ব্যাপারটা প্রত্যেক বছর প্রকট হয়ে ধরা পড়ে জাতীয় বাজেট প্রস্তাবনার পরে। এবারও প্রত্যাশা পূরণ হলো না আইসিটিসংশ্লি-ষ্টদের। তাদের অনেক অনুযোগ রয়েছে। আগেও ছিল, নতুন করেও উঠেছে। বলা হচ্ছে, অর্থমন্ত্রী জাতীয় সংসদে বাজেট বক্তৃতায় আইসিটির প্রয়োজনীয়তা এবং কার্যকারিতার কথা বললেও বাস্তব ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয়তা এবং সংশ্লি-ষ্টদের দাবিদাওয়ার প্রতি তেমন একটা নজর দেননি। আসল বিষয় হচ্ছে গতানুগতিকতা থেকে বের হতে পারেনি সরকার।

সেই বহু বছর আগে, যখন আগেরবার আওয়ামী লীগ সরকার ক্ষমতায় ছিল এবং শাহ এএমএস কিবরিয়া অর্থমন্ত্রী ছিলেন, সেই সময় কিছুটা সুবাতাস যেন বয়েছিল অন্তত দুটি বাজেটে। তারপর থেকে আবার সেই গতানুগতিকতা বা উনিশ-বিশ করে চলছে।

আমরা অবশ্যই বুঝি সরকারকে অনেক ঝক্কি সামলে দেশ চালাতে হয়। পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়-অর্থ মন্ত্রণালয়কেও অনেক সুকঠিন দায়িত্ব পালন করতে হয়। এমন অনেক সিদ্ধান্ত নিতে হয় যাতে বিতর্কের অনেক অবকাশ আছে এবং রাজনৈতিক ঝুঁকিও আছে। এই যেমন এবছর সারের ওপর ভর্তুকি কমানোর কথা বলা হয়েছে। বিষয়টা অনেক মহলকে বিস্মিত করেছে। সে তুলনায় অবশ্য আইসিটিসংশ্লি-ষ্টদের বিস্ময় কম। কারণ, এতদিনে বঞ্চিত হতে হতে অনেক কিছুই তাদের জন্য সহনীয় হয়ে গেছে। আর অনেকেই এখন আর সরকারকে 'ডিজিটাল বাংলাদেশ' গড়া তথা 'রূপকল্প ২০২১' বাস্তবায়নের কথাও মনে করিয়ে দিতে চান না।

এদেশে অনেক কিছু এমনিতেই হয়ে যায়। যেমন- কৃষকের কোনো কোনো ফসল বাম্পার ফলানো। আইসিটির ক্ষেত্রেও বলা যায়, ব্যক্তি পর্যায়ে এর ব্যবহার ক্রমাগত বেড়ে চলা এবং শহরাঞ্চলের নতুন প্রজন্ম কোনো না কোনো উপায়ে আইসিটির ব্যবহারে অভ্যস্ত হয়ে উঠছে। মোবাইল ফোনের ইন্টারনেটভিত্তিক অ্যাপ্লি-কেশনগুলোর ব্যবহারও ক্রমাগত বাড়ছে। কিন্তু এগুলো হচ্ছে পরিকল্পনার বাইরের ব্যাপার এবং সত্যি কথা হলো এ ধরনের ব্যবহারের অর্থনৈতিক দিকটা খুবই দুর্বল। পরিকল্পিত বিষয়গুলোর মধ্যে বলা যায় ই-টেন্ডার প্রচলন এবং দেশের কয়েকটি অঞ্চলে টেলিসেন্টার প্রচলনের ব্যবস্থাকে। এর বাইরে অনেকটা ভাসমান অবস্থাতেই রয়ে গেছে ই-কমার্স প্রচলনের বিষয়টি। ই-গভর্নেন্স যেন আরও দূরবর্তী বিষয়।

এর বাইরে বাংলাদেশের জন্য আসলে প্রয়োজন ছিল শিক্ষাবিষয়ক দুটি পরিকল্পনা এবং তা বাস্তবায়নের দিকনির্দেশনা। প্রথমত, প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরে কমপিউটারভিত্তিক শিক্ষাদানের জন্য প্রয়োজনীয় বিষয়গুলো সম্পন্ন করা। এর জন্য প্রয়োজন শিক্ষক প্রশিক্ষণ ও কনটেন্ট তৈরির জন্য বিশেষ বরাদ্দের। আর দ্বিতীয়ত, উচ্চতর পর্যায়ে প্রোগ্রামার এবং স্পেশালিস্ট পর্যায়ের প্রশিক্ষণ সুযোগ বাড়ানো ও গবেষণা খাতে বরাদ্দ।

এ বিষয়গুলো আগের মতোই থেকে যাচ্ছে বলেই বোধ হচ্ছে। এছাড়া প্রযুক্তি সুবিধা তৃণমূল পর্যায়ে বিস্তারেরও খুব একটা জোরালো নির্দেশনা পাওয়া গেল না।

এদেশে সার্ভিসভিত্তিক যে বিষয়গুলো এখন পর্যন্ত অমীমাংসিত রয়ে গেছে সেগুলোর সবই ই-কমার্সের সাথে সম্পর্কিত। বিশ্ববাণিজ্যের সাথে সমতাভিত্তিক ইন্টারনেট অ্যাপ্লি-কেশনের ভিত্তি তৈরির কাজটি ঠিকমতো না হওয়াতেই দুশ্চিন্তার রেখা দেখা যাচ্ছে অনেকের কপালে। কারণ, একটা করে বছর যাচ্ছে আর আমাদের পিছিয়ে পড়ার বিষয়টাও বেশ প্রকট হয়ে উঠছে। প্রযুক্তিগত দিক দিয়ে যোগাযোগের যন্ত্র যতই ছোট এবং কার্যকর হয়ে উঠছে ততই সার্ভিসগুলোর বাণিজ্যিক সম্ভাবনা নতুন মাত্রা তৈরি করছে। কিন্তু বাংলাদেশের বাস্তবতায় অনেক সার্ভিসই কাগজে পর্যায়ে রয়ে গেছে। এর কারণ হয়ত বেসরকারি প্রতিষ্ঠানগুলোর সাথে সরকারের সমন্বয়ের অভাব। তথ্য ও যোগাযোগপ্রযুক্তির অনেক কিছুই এখন মোবাইল অপারেটরদের হাতে চলে যাওয়ায় সরকারের নীতিনির্ধারকদের অস্বস্তি বাড়ছে তাতে সন্দেহ নেই। যে প্রযুক্তিসুবিধা সাধারণ মানুষকে দেয়ার কাজ সরকারের করা উচিত ছিল সেগুলো বেসরকারি বিশেষত বিদেশি মালিকানায় টেলিকম অপারেটরেরা করতে চাচ্ছে বা তারা সে সক্ষমতার অধিকারী হয়েছে। কিন্তু নীতি বা আগেকার ধারণায় বিষয়গুলোকে অবৈধ বলে প্রতিপন্ন করা হচ্ছে কিংবা এগুলোর ওপর কী ধরনের করারোপ/শুল্ক নির্ধারণ করলে সমুচিত হবে তা পরিকল্পনাবিদ এবং নীতিনির্ধারকরা বুঝতে পারছেন না। এটা একটা বহু বছরের সমস্যা। কিন্তু এগুলো যদি অটিকে থাকে তাহলে ই-কমার্স কেনো সাধারণ বাণিজ্যও বিঘ্নিত হবে।

এই সরকার ক্ষমতায় আসার পর থেকে আইসিটিসংশ্লি-ষ্টরা আশায় বুক বেঁধে আছেন, দেশের উন্নয়নে অবদান রাখার একটা সুযোগ সম্ভবত তারা একবার পাবেন। আর এই সুযোগ পেলে তারা দেখিয়ে দিতে পারবেন একটা সমৃদ্ধ ভবিষ্যতের পথ। সেজন্য তারা যা চান তাহলো আইসিটিবিষয়ক পণ্য ও সার্ভিস যেগুলো বৈশ্বিকভাবে স্বীকৃত সেগুলো আমাদের দেশের মানুষ এবং বাণিজ্যিক খাতের জন্য সহজলভ্য করে দেয়া। এছাড়া ইতোমধ্যে প্রচলিত হয়ে যাওয়া সুযোগগুলোকে এদেশেও ব্যবহার উপযোগী করার পরামর্শ দেন তারা।

এখন বাংলাদেশের জন্য সবচেয়ে সম্ভাবনার বাণিজ্যিক বিষয়গুলো হচ্ছে আইসিটিবিষয়ক আউটসোর্সিং এবং বিভিন্ন সার্ভিসভিত্তিক বেসরকারি উদ্যোগ নেয়া। এক্ষেত্রে আর্থিক ও প্রযুক্তিগত বৈধতার প্রশ্নে কতগুলো প্রতিবন্ধকতা বছরের পর বছর ধরে রয়েই যাচ্ছে। ইন্টারনেটভিত্তিক পেমেন্টের বিষয়টি এখন পর্যন্ত অনিশ্চিত রয়ে গেছে। গত বছর দশেকের পর্যবেক্ষণে দেখা যাচ্ছে, বাংলাদেশের সমপর্যায়ের বা একটু এগিয়ে থাকা উন্নয়নশীল দেশগুলো আইসিটিবিষয়ক কিছু পদক্ষেপ নিয়ে আলাদা একটা স্থিতিশীল শিল্প গড়ে তুলতে পেরেছে। বিশ্বমন্দার নেতিবাচক প্রকোপের মধ্যেও এই শিল্প টিকে গেছে। উন্নত দেশগুলোর অনেক কোম্পানিই আউটসোর্সিংয়ের সুবাদে অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখতে পেরে এখন আরও বেশি নিরাপদ বিনিয়োগের সুযোগ খুঁজছে। এছাড়া সামাজিক বাণিজ্যের আউটসোর্সিং বা এ খাতে বিদেশি বিনিয়োগ যাই বলুন- নতুন সুযোগ সৃষ্টি হচ্ছে। মোটা অঙ্কের কিছু অফারও আমরা ইতোমধ্যে পেয়েছিলাম। কিন্তু দুর্ভাগ্যজনক হচ্ছে এগুলোকে সাপোর্ট দেয়ার মতো আইনগত ও আর্থিক নিয়ম আমরা গড়ে তুলিনি। ফলে একটা শূন্যতা রয়ে যাচ্ছে সুযোগ ও বাস্তবায়নের মধ্যে।

সবশেষে যেটা বলা দরকার শিক্ষণ, বাণিজ্যিক ও আর্থিক সুযোগ সৃষ্টি আর তৃণমূল পর্যায়ে কানেক্টিভিটি, এগুলোর কোনো বিকল্প এ যুগে নেই। শুধু আইসিটিভিত্তিক বাণিজ্য নয়, বিশ্বের সাধারণ বাণিজ্যিক প্রবণতার সমকক্ষতা অর্জনের জন্যও আমাদের আইসিটিবিষয়ক সুযোগসুবিধা, নিয়মনীতি, লোকবলের উন্নতি সবই একসাথে করে যেতে হবে। উনিশ-বিশ করে যত সময়ক্ষেপণ করা হচ্ছে ততই বোঝা বা চাপ বাড়ছে। আসলে এখন একটা দায়ই তৈরি হয়ে গেছে। কীভাবে এ দায়মুক্তি সম্ভব তা না বোঝার মতো অবস্থায় সম্ভবত নীতিনির্ধারকেরা নেই। উন্নয়নশীল দেশগুলোর উদাহরণ কিংবা নিজেদের সাহসী সিদ্ধান্ত নিয়ে এ সমস্যাগুলোর সমাধান বোধহয় সম্ভব।

ফিডব্যাক : abir59@gmail.com